BNGH 101

Semester - 1

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য গ্রন্থ। এটিই প্রথম বাংলায় রচিত কৃষ্ণকথা বিষয়ক কাব্য। মনে করা হয়, এই গ্রন্থের পথ ধরেই বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলির পথ সুগম হয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী মানবীয়ভাবে উঠে এলেও, মূলত রাধা-কৃষ্ণকথার আড়ালে ঈশ্বরের প্রতি জীবকুলের মিলনের চরম আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে এই কাব্যে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রধান চরিত্র তিনটি। কৃষ্ণ, রাধা, বড়ায়ি। কৃষ্ণ পরমাত্মা বা ঈশ্বরের প্রতীক, রাধা জীবাত্মা বা প্রাণিকুলের প্রতীক ও বড়ায়ি এই দুইয়ের সংযোগ সৃষ্টিকারী অনুঘটক।

আবিষ্কার ও নামকরণঃ

চর্যাপদের পর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাংলা ভাষার দ্বিতীয় প্রাচীনতম আবিষ্কৃত নিদর্শন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং পুথিশালার অধ্যক্ষ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামে জনৈক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় পুথিটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পুথির প্রথম দুটি ও শেষ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি বলে এর নাম ও কবির নাম স্পষ্ট করে জানা যায় নি। কাব্যে বড়ু চণ্ডীদাসের তিনটি ভণিতা পাওয়া যায় – 'বড়ু চণ্ডীদাস', 'চণ্ডীদাস' ও 'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস'। এর মধ্যে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতা মিলেছে ২৯৮টি স্থানে ও 'চণ্ডীদাস' ভণিতা মিলেছে ১০৭ বার। ৭টি পদে ব্যবহৃত 'অনন্ত' শব্দটি প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে করা হয়। ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা মনে করেন, চণ্ডীদাস তাঁর নাম এবং বড়ু প্রকৃত পক্ষে তাঁর কৌলিক উপাধি বাঁড়ুজ্যে বা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপভ্রংশ।
আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় প্রাচীন বৈষ্ণব লেখকদের ইঙ্গিত অনুসরণ করে গ্রন্থের নামকরণ করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। অবশ্য পুথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুটে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' লেখা থাকায় অনেকে অনেকে গ্রন্থটিকে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামকরণের পক্ষপাতী।

চণ্ডীদাসঃ

মধ্যযুগে বাংলা কাব্যে অন্তত চারজন চণ্ডীদাসের কবিতা পাওয়া যায়। এরা হলেন বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস। এই চারটি নামের মধ্যে শেষ তিনটি নাম একজনের নাকি তাঁরা পৃথক কবি তা নিশ্চিত করে আজও বলা যাচ্ছে না। এই অভূতপূর্ব সমস্যা বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস-সমস্যা নামে পরিচিত।

বড়ু চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতকের কবি। তিনি ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে ছাতনা, বাঁকুড়া মতান্তরে বীরভূমের নানুর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। কবির আসল নাম অনন্ত, কৌলিক উপাধি বড়ু, গুরুপ্রদত্ত নাম চণ্ডীদাস। বড়ু অন্যান্য চণ্ডীদাসদের তুলনায় প্রাচীনতম ও প্রাকচৈতন্য যুগের। তিনি বাংলা ভাষার প্রথম মানবতাবাদী কবি।

'শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই

এই অমর মানবাতার বাণী জাত-পাতযুক্ত তৎকালীন সমাজে প্রথম কাব্যে ধারণ করেছেন অসীম সাহসের সাথে। তিনি ব্যক্তি জীবনেও ছিলেন জাত-সংস্কারের ঊর্ধে।

চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কবি ছিলেন এবং বাশুলী দেবীর ভক্ত ছিলেন। বাশুলী মন্দিরের পুরোহিত থাকার সময় রামী নামের এক রজকিনীর প্রেমে মুগ্ধ হন। তিনি রামীর মধ্যে রাধারূপ দেখেন। জমিদার এই প্রণয়কে অবৈধ আখ্যা দিয়ে চণ্ডীদাসকে সমাজ চ্যুত ও মন্দির থেকে বিতারিত করে। তিনি আনুমানিক ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনিঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য তেরটি খণ্ডে রচিত। খণ্ডগুলোঃ জন্ম খণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দান খণ্ড, নৌকা খণ্ড, ভার খণ্ড, ছত্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, বংশী খণ্ড, বিরহ খণ্ড।

জন্ম খণ্ডঃ

কৃষ্ণ ও রাধা উভয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় মর্তে মানবরূপে জন্ম নিয়েছে। কৃষ্ণ পাপী কংস রাজাকে বধ করার জন্য দেবকী ও বাসুদেবের সন্তান হিসেবে জন্ম নেয়। কংস রাজা কৃষ্ণকে হত্যা করতে পারে এই ভয়ে, কৃষ্ণের জন্মমাত্র বাসুদেব গোপনে তাঁকে অনেক দূরে বৃন্দাবনে জনৈক নন্দ গোপের ঘরে রেখে আসে। সেখানেই দৈব ইচ্ছায় আরেক গোপ সাগর গোয়ালার স্ত্রী পদ্মার গর্ভে জন্ম নেয় রাধা। দৈব নির্দেশেই বালিকা বয়সে নপুংসক (ক্লীব) অভিমন্যু বা আইহন বা আয়ান গোপের (ঘোষের) সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়। আয়ান গোচারণ করতে গেলে বৃদ্ধা পিসি বড়ায়িকে রাধার তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

তাম্বুল খণ্ডঃ

তাম্বুল অর্থ পান। রাধা ঘর থেকে বের হয়ে অন্য গোপীদের সঙ্গে মথুরাতে দই-দুধ বিক্রি করতে যায়। বড়ায়ি তাঁর সঙ্গে যায়। বৃদ্ধা বড়ায়ি পথে রাধাকে হারিয়ে ফেলে এবং রাধার রূপের বর্ণনা দিয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে, এমন রূপসীকে সে দেখেছে কিনা। এই রূপের বর্ণনা শুনে রাধার প্রতি কৃষ্ণ পূর্বরাগ অনুভব করে। সে বড়ায়িকে বুঝিয়ে রাধার জন্য পান ও ফুলের উপহারসহ প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু বিবাহিতা রাধা সে প্রস্তাব পদদলিত করে।

দান খণ্ডঃ

দই-দুধ বিক্রির জন্য মথুরাগামী রাধা ও গোপীদের পথ রোধ করে কৃষ্ণ। তার দাবী নদীর ঘাটে পারাপার-দান বা শুল্ক দিতে হবে, তা না হলে রাধার সঙ্গে মিলিত হতে দিতে হবে। রাধা কোনোভাবেই এ প্রস্তাবে রাজী হয় না। এ দিকে তাঁর হাতেও কড়ি নেই। সে নিজের রূপ কমাবার জন্য চুল কেটে ফেলতে চাইল; কৃষ্ণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বনে দৌড় দিল। কৃষ্ণও পিছু ছাড়বার পাত্র নয়। অবশেষে কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম হয়।

নৌকা খণ্ডঃ

এরপর থেকে রাধা কৃষ্ণকে এড়িয়ে চলে। কৃষ্ণ নদীর মাঝির ছদ্মবেশ ধারণ করে। একজন পার করা যায় এমন একটি নৌকাতে রাধাকে তুলে সে মাঝ নদীতে নিয়ে নৌকা ডুবিয়ে দেয় এবং রাধার সঙ্গ লাভ করে। নদী তীরে উঠে লোকলজ্জার ভয়ে রাধা সখীদের বলে যে, নৌকা ডুবে গিয়েছে, কৃষ্ণ না থাকলে সে নিজেও মরত, কৃষ্ণ তাঁর

জীবন বাঁচিয়েছে।

ভার খণ্ডঃ

শরৎকাল। শুকনো পথ ঘাটে হেঁটেই মথুরাতে গিয়ে দই-দুধ বিক্রি করা যায়। কিন্তু রাধা আর বাড়ির বাইরে আসে না। শাশুড়ি বা স্বামীকে সে আগের ঘটনাগুলো ভয়ে ও লজ্জায় খুলে বলে নি। এদিকে রাধা অদর্শনে কৃষ্ণ কাতর। সে বড়ায়িকে দিয়ে রাধার শাশুড়িকে বোঝায়, ঘরে বসে থেকে কি হবে, রাধা দুধ-দই বেচে কটি পয়সা তো আনতে পারে। শাশুড়ির নির্দেশে রাধা বাইরে বের হয়। জিন্তু প্রচণ্ড রোদে কোমল শরীরে দই-দুধ বহন করতে গিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই সময়ে কৃষ্ণ ছদ্মবেশে মজুরী করতে আসে। পরে ভার বহন অর্থাৎ মজুরির বদলে রাধার আলিঙ্গন কামনা করে। রাধা এই চতুরতা বুঝতে পারে। সেও কাজ আদায়ের লক্ষ্যে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। কৃষ্ণ আশায় আশায় রাধার পিছু পিছু ভার নিয়ে মথুরা পর্যন্ত চলে।

ছত্র খণ্ডঃ

দুধ-দই বেচে এবার মথুরা থেকে ফেরার পালা। কৃষ্ণ তাঁর প্রাপ্য আলিঙ্গন চাইছে। রাধা চালাকি করে বলে, ‘এখনো প্রচণ্ড রোদ। তুমি আমাদের ছাতা ধরে বৃন্দাবন পর্যন্ত চলো। পরে দেখা যাবে’। কৃষ্ণ ছাতা ধরতে লজ্জা ও অপমান বোধ করছিল। তবুও আশা নিয়ে ছাতা ধরেই চলল। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ন করেনি রাধা।

বৃন্দাবন খণ্ডঃ

রাধার বিরুদ্ধ মনোভাব কৃষ্ণকে ভাবান্তর ঘটায়। সে অন্য পথ অবলম্বন করে। নিজে কটু বাক্য বলে না, দান বা শুল্ক আদায়ের নামে বিড়ম্বনা করে না, বরং বৃন্দাবনকে অপূর্ব শোভায় সাজিয়ে তুলল। রাধা ও গোপীরা সেই শোভা দর্শন করে কৃষ্ণের উপর রাগ ভুলে যায়। তাঁরা পরিবর্তিত কৃষ্ণকে দেখতে আগ্রহ দেখায়। কৃষ্ণ সব গোপিকে দেখা দেয়। পরে রাধার সঙ্গে তাঁর দর্শন ও মিলন হয়।

কালিয়দমন খণ্ডঃ

যমুনা নদী বৃন্দাবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত। সেখানে কালিয়নাগ বাস করে। তার বিষে সেই জল বিষাক্ত। কৃষ্ণ কালিয়নাগকে তাড়াতে নদীর জলে ঝাঁপ দেন। দৈব ইচ্ছায় ও কৃষ্ণের বীরত্বে কালিয়নাগ পরাস্ত হয় এবং দক্ষিন সাগরে বসবাস করতে যায়। কালিয়নাগের সঙ্গে কৃষ্ণ যখন জলযুদ্ধে লিপ্ত, তখন রাধার বিশেষ কাতরতা প্রকাশ পায়।

যমুনা খণ্ডঃ

রাধা ও গোপীরা যমুনাতে জল আনতে যায়। কৃষ্ণ যমুনার জলে নেমে হটাৎ ডুব দিয়ে আর উঠে না। সবাই মনে করে কৃষ্ণ দুবে গেছে। এদিকে কৃষ্ণ লুকিয়ে কদম গাছে বসে থাকে। রাধা ও সখীরা জলে নেমে কৃষ্ণকে খুঁজতে থাকে। কৃষ্ণ নদী তীরে রাধার খুলে রাখা হার চুরি করে আবার গাছে গিয়ে বসে।

হার খণ্ডঃ

পরে কৃষ্ণের চালাকি রাধা বুঝতে পারে। হার না পেয়ে রাধা কৃষ্ণের পালিতা মা যশোদার কাছে নালিশ করে। কৃষ্ণও মিথ্যে বলে মাকে। সে বলে, আমি হার চুরি করব কেন, রাধাতো পাড়া সম্পর্কে আমার মামি। এদিকে বড়ায়ি সব বুঝতে পারে এবং রাধার স্বামী আয়ান হার হারানোতে যাতে রাগান্বিত বা ক্ষুব্ধ না হয় সেজন্য বলে যে, বনের কাঁটায় রাধার গজমোতির হার ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেছে।

বাণ খণ্ডঃ

মায়ের কাছে নালিশ করায় কৃষ্ণ রাধার উপর ক্ষুব্ধ। রাধাও কৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন নয়। বড়ায়ি বুদ্ধি দিল, কৃষ্ণ যেন শক্তির পথ পরিহার করে মদনবাণ বা প্রেমে রাধাকে বশীভূত করে। সে মতো কৃষ্ণ পুষ্পধনু নিয়ে কদমতলায় বসে। রাধা কৃষ্ণের প্রেমবাণে মূর্চ্ছিত ও পতিত হয়। এরপর কৃষ্ণ রাধাকে চৈতন্য ফিরিয়ে দেয়। রাধা কৃষ্ণপ্রেমে কাতর হয়ে কৃষ্ণকে খুঁজে ফেরে।

বংশী খণ্ডঃ

রাধাকে আকৃষ্ট করার জন্য সময়-অসময়ে কৃষ্ণ বাঁশিতে সুর তোলে। কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার রান্না এলোমেলো হয়ে যায়, মন কুমারের চুল্লির মতো পুড়তে থাকে, রাত্রে ঘুম আসে না, ভোর বেলা কৃষ্ণ অদর্শনে রাধা মূর্চ্ছা যায়। বড়ায়ি রাধাকে পরামর্শ দেয়, সারারাত বাঁশি বাজিয়ে সকালে কদমতলায় কৃষ্ণ বাঁশি শীয়রে রেখে ঘুমায়। তুমি সেই বাসি চুরি কর, তাহলেই সমস্যার সমাধান হবে। রাধা তাই করে। কৃষ্ণ বুদ্ধিমান। বাঁশি চোর কে তা বুঝতে তাঁর কোনো কষ্ট হয় না। রাধা কৃষ্ণকে বলে, বড়ায়িকে সাক্ষী রেখে কৃষ্ণকে কথা দিতে হবে যে, সে কখনো রাধার কথার অবাধ্য হবে না ও রাধাকে ত্যাগ করে যাবে না, তাহলেই বাঁশির সন্ধান মিলতে পারে। কৃষ্ণ কথা দিয়ে বাঁশি ফিরে পায়।

বিরহ খণ্ডঃ

কৃষ্ণ তারপরও রাধার উপর উদাসীন। এদিকে মধুমাস সমাগত।রাধা বিরহ অনুভব করে। রাধা বড়ায়িকে কৃষ্ণকে এনে দিতে বলে। দই-দুধ বিক্রির ছল করে রাধা নিজেও কৃষ্ণকে খুঁজতে বের হয়। অবশেষে বৃন্দাবনে বাঁশি বাজানো অবস্থায় কৃষ্ণকে খুঁজে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাধাকে বলে, 'তুমি আমাকে নানা সময় লাঞ্ছনা করেছো, ভার বহন করিয়েছো, তাই তোমার উপর আমার মন উঠে গেছে'। রাধা বলে, 'তখন আমি বালিকা ছিলাম, আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তির্যক দৃষ্টি দিলেও তুমি আমার দিকে তাকাও'। কৃষ্ণ বলে, 'বড়ায়ি যদি আমাকে বলে যে তুমি রাধাকে প্রেম দাও, তাহলে আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারি'। অবশেষে বড়ায়ি রাধাকে সাজিয়ে দেয় এবং রাধা কৃষ্ণের মিলন হয়। রাধা ঘুমিয়ে পড়লে কৃষ্ণ নিদ্রিত রাধাকে রেখে কংসকে বধ করার জন্য মথুরাতে চলে যায়। ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণকে না দেখে রাধা আবার বিরহকাতর হয়। রাধার অনুরোধে বড়ায়ি কৃষ্ণের সন্ধানে যায় এবং মথুরাতে কৃষ্ণকে পেয়ে অনুরোধ করে, 'রাধা তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তুমি উন্মাদিনীকে বাঁচাও'। কিন্তু কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যেতে চায় না, রাধাকে গ্রহন করতে চায় না। কৃষ্ণ বলে, 'আমি সব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু কটু কথা সহ্য করতে পারি না। রাধা আমাকে কটু কথা বলেছে'। ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য এখানে ছিন্ন। পৃষ্ঠা পাওয়া না যাওয়ায়, এ কাব্যের সমাপ্তি কেমন তা জানা যায় নি।)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কৃষ্ণচরিত্রের অভিনবত্ব:

দীর্ঘকাল ধরে পদাবলী সাহিত্য পাঠের সূত্রে কৃষ্ণচরিত্রের যে মহিমান্বিত, প্রেমিক অথচ সম্ভ্রম উদ্রেককারী ব্যক্তি হিসাবে কৃষ্ণ চরিত্রের যে দৈব মহিমা বাঙালি পাঠক পরিচিত হয়েছে, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কৃষ্ণ চরিত্রের সঙ্গে তা কোন সাদৃশ্য নেই। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে জন্ম খন্ডে কৃষ্ণের আর্বিভাবের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যে কারণ দেখানো হয়েছে সেখানে কিন্তু পৌরাণিক মহিমার অবকাশ ছিল। কবি আমাদের জানিয়েছেন;- **"কংসের কারণে হ এ সৃষ্টির বিনাশে"।** কংস নিধনের কারণে বিষ্ণুর স্বয়ং কৃষ্ণ রূপে মর্তে আর্বিভাব এবং দেবী লক্ষ্মী রাধা রূপে মর্তে আগমন হয়েছে। কিন্তু এই পর্যন্তই তাম্বুল খন্ড থেকে রাধাবিরহ অংশ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

কাব্যের কাহিনীর যে বিস্তার সেখানে কিন্তু এই সম্ভ্রমযুক্ত পৌরাণিক দৈব মহিমার কোনো অবকাশ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে যে কৃষ্ণকে আমরা পেয়েছি তিনি মথুরা-বৃন্দাবনের আদিম পল্লীর এক রুচিহীন অবাঞ্চিত গো-তরুণ। অর্থাৎ বলা যেতে পারে জন্ম খন্ড এবং যমুনা খণ্ডে কিছু পুরাণ কথা ছাড়া এ কৃষ্ণের কোথাও দেবত্বের এতটুকুও অবকাশ দেখা যায় না।

♦ **তাম্বুল খণ্ডে** আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পাই, রাধা সম্ভোগের প্রতি তাঁর অধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। বড়াই বনমধ্যে রাধাকে হারিয়ে কৃষ্ণের কাছে শরনাপন্ন হলে কৃষ্ণ চতুরতার দ্বারা বড়ায়িকে রাধার রূপের বর্ণনা করতে বলেন;-**"উদ্দেশ বুলিব মঁবে রাধিকার আহ্মে।/তঁবে ভালমঁতে তার রূপ কহ তোহ্মে"।** রাধার রূপের কথা শুনে কৃষ্ণ রাধার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বড়ায়ির মাধ্যমে কর্পূর মিশ্রিত তাম্বুলসহ প্রেম প্রস্তাব প্রেরণ করেন। কিন্তু রাধা তা প্রত্যাখ্যান করেন। এবং আমাদের জানিয়ে দেয় সে পরপুরুষের স্ত্রী। ভদ্রতার অবকাশ থাকলে, রুচি স্নিগ্ধ মনের অধিকারী হলে কৃষ্ণ এরপরে অপ্রসন্ন হতেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কৃষ্ণ এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ছলা-কলার আশ্রয় নিয়েছে।

♦ তারই ফলশ্রুতিতে **দানখণ্ডে** রাধার পথ অবরোধ করে কানু প্রথমে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশষণ করেন অতি নির্লজ্জভাবে এবং তার কাছে বারো-বছরের দান চেয়ে বসেছে। রাধা যৌবন অধিকারের জন্য আত্মম্ভরিতা ও আত্মস্ফালন তিনি কম করেননি;-**"তোর কংসে মোর কিছু করিতেঁ না পারে।/তোহ্মারি সে রূপেঁ মোরে মরিবারে পারে"।।**

কৃষ্ণের এরকম আত্ম অহমিকা প্রকাশক উক্তি দানখন্ডে প্রচুর আছে। রাধার সমস্ত অনুরোধ, অনুনয় উপেক্ষা করে অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণ তাকে বলপূর্বক সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ করেছে।

♦ **নৌকাখণ্ডে** দেখি একইভাবে কৃষ্ণ ঘাটিয়াল এর বেশ ধারণ করে যমুনার ঘাটে রাধার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাধার সমস্ত সখীদের পরপার করবার পর একা রাধাকে নৌকায় তুলে মিলনের প্রস্তাব দিলেন কৃষ্ণ। নৌকাডুবি করিয়ে রাধার প্রাথমিকভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৃষ্ণ জল-বিহারে মেতে উঠেছে।

♦ **ভারখন্ডে** অবশ্য রাধার চাতুুরির কাছে কৃষ্ণকে হার মানতে হয়েছে। সেই সঙ্গে নিজের মর্যাদাহানির বেদনা ও লজ্জা যুক্ত হয়েছে। এই খণ্ডে মিলনের আশা দিয়ে ও রাধা তা রক্ষা করতে পারেন পারিনি।

♦ ফলে **ছত্রখণ্ডে** দেখি'কোপিল কাহ্নাঞি'রাধার সঙ্গ ছাড়ছেন না। কিন্তু রাধা ও সহজে ছাড়ার পাত্রী নন। শেষ পর্যন্ত রাধা রতিদানের সম্মত হন কিন্তু একটি শর্তে। বড়ায়ি কৃষ্ণকে সেই শর্তের কথা জানায়;-**"তোর ভাগেঁ দিল রাধা রতি অনুমতী।/হরিষ করিআঁ তার মাথে ধর ছাতী"।**

পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ **বৃন্দাবন খন্ডে** আমরা দেখি কৃষ্ণের আকুলতা রাধাকে পাবার যে কৌশল ও অভিষ্ট সিদ্ধতে সক্ষম হয়েছে। রাধাকে দেওয়া পরামর্শ অনুসারে কৃষ্ণ অনান্য গো-বধূদের ঘর থেকে বার করে এনেছে তা তৈরি উদ্যানে।

♦কিন্তু বৃন্দাবন খন্ডের এই ঘটনার পর ও এই গ্রামীন প্রেমিকের স্থূল আচরণ আমাদের বারবার আহত করে। **হারখণ্ডে** এই কৃষ্ণই রাধার হার চুরি করেও রাধার অভিযোগকেও অস্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, রাধার চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ ও অক্লেশে উচ্চারণ করেছে যশোদার কাছে।

পরবর্তী **বাণখণ্ডে** তারই প্রতিক্রিয়ায় আর বড়ায়ির প্ররোচনায় কৃষ্ণ-রাধার প্রতি নিষ্ঠুর বাণ নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু এরপর ব্যাকুল আর্ত কৃষ্ণ-রাধার জন্য ক্রন্দন করেছে। এক সময় কৃষ্ণের মুখে উচ্চারিত হয়েছে;-**"আহ্মার জীবন**

রহে তোহ্মার জীবনে"।। এই একটি কথাই যেন এক পলকে সমস্ত রূঢ়তা আর স্থুলতার আবরণ সরিয়ে কৃষ্ণের প্রেমিক সত্তাকে উন্মোচিত করে।

আবার **বংশীখণ্ডে** কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে রাধাকে উন্মাদিনী করে তুলেছে।

রাধাবিরহ অংশে দেখি কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে আবার মিলিত হয়েছে। মিলিত হওয়া সত্বেও প্রেমের আবহ তেমন সৃষ্টি হয়নি। রাধা সম্পর্কে তিনি অশালীন শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা কৃষ্ণ রাধাকে ছেড়ে চলে গেছে।সূচনায় রাধা যাই থাকুক না কেন, এখন তিনি শুধুমাত্র কৃষ্ণ সমর্পিত প্রাণা। এখন তার মন ও শরীর শুধুমাত্র কৃষ্ণের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। অথচ চতুর নাটোরের মত কৃষ্ণ তার ইচ্ছা পূরণ করেও রাধার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক রাখেনি।

সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পুরুষের ক্ষেত্রে এই সামাজিক অন্যায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। কৃষ্ণের আচরণের মধ্য দিয়েই তারই পুনরাবৃত্তি সেখানে আর যাই থাক, তথাকথিত দেবত্বের চিহ্নমাত্র নেই। একান্তভাবেই বিশেষ করে লৌকিক সংস্কৃতি অবলম্বন করে কৃষ্ণকে সৃষ্টি করলেন বড়ু চন্ডীদাস। পরবর্তীকালে রচিত পদাবলী সাহিত্যে কৃষ্ণ অপ্রাকৃত ভাব-বৃন্দাবনের চিরকিশোর প্রেমিক।

জয়দেবের **'গীতগোবিন্দ'**এর নায়কের মতোই মূর্তিয়মান**'উজ্জ্বলনীলমণি'।** শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ তাঁর অজস্র উৎকট অসঙ্গতি নিয়েও শিল্পীর হাতে আঁকা জীবন্ত মানুষ।